

ইসলাম এবং কুসংস্কার-(৭ম খন্ড)

(নবী (সঃ) এর মল-মুত্র থেকে আতরের সুবাস)

সাইদ কামরান মির্জা

ইউ এস এ

জুন ১২, ২০০৫

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড' পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডেই যাবে এবং ভূমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভূমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন **popular belief held without any reason or logic**. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমাণ বিহীন কথা যাহা সাধারণতঃ মুর্খরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (**Folklore**) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোককথা বা কেছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মূলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদানই (**Ingredients**) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মূল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপূর্ণ কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মূল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উস্মাদনা বা **fanatical believers** বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাথেও

(ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা) এরূপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামী কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেশতের কুঞ্জ, বেহেশতী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আশ্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিশার্সদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করণ বের করেও কুলোতে পারছেন।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে ‘কাছাছুল আশ্বিয়া’ সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম ‘কাছাছুল আশ্বিয়া’ যার অর্থ দাড়ায়—‘নবীগনের জীবনী’। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার করছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার— এম, এন, এম ইমদাদুল্লাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়েও মূল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষণ কুসংস্কারে পূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারণ বিশ্বাসী মুসলিমগণ পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরও বেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাক্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবি কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কারপূর্ণ ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে

পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ**

মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু। ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগণ অতি প্রিয় হয় যে কারণে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা (যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী) আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্ধি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপূর্ণ মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে, আল্লাহর তায়ালার নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হাজার সাধারণ অশিক্ষিত, অধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাাদের ওয়াজ তন্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাাদের বক্তব্যে বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পূর্ণ ইসলামের বিভিন্ন কিছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান। বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত ‘কাছাছুল আশ্বিয়া’ কিতাবটিই যে মাওলানাাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্ধেহ নেই। এইসব কুসংস্কারপূর্ণ গল্প মাওলানাাদের মুখে শুন্যরপর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপূর্ণ ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপূর্ণ কেছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা’শালাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে ছুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্প কিছু রসালো মন্তব্য (ব্রাকেটের ভিতরে) থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ পূর্বের খন্ডে ৩২-৪১ সংখ্যা পর্যন্ত লেখা হয়েছিল)

(৪২) আল্লাহ তায়ালা কিভাবে এই পৃথিবী তৈরী করেনঃ

পাঠকগন এবার শুনুন আমাদের পৃথিবী সৃষ্টির আসল রহস্য যাহা উদ্ধার করেছেন আমাদের নবী (সঃ) এবং তার সঙ্গিগন, অবশ্য ইসলামিক বিজ্ঞানের সুত্রের দ্বারা। বিভিন্ন ইসলামি কিতাবের মতে আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী তৈরীর তিন রকমের ‘বয়ান’ পাওয়া যায়। বয়ান গুলো নিম্নরূপ।

(এক) বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিতের বই থেকে জানা যায়, “আবদুল্লাহ-বিন মাসুদ এবং আরও অন্যান্য নবীজির সঙ্গিদের মতে—“আল্লাহই তৈরী করেছেন এই পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যে যা’ কিছু আছে। প্রথমে আল্লাহর সিংহাসনটি ছিল পানির উপর; তখনো তিনি অন্য আর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। তারপর তিনি পানি থেকে ধূয়ার সৃষ্টি করেন। ধূয়া পানির উপরে চলে আসে এবং তাহা অনেক উপরে

উঠে পানির উপরে ছাদের মত হয়ে যায়। আল্লাহ এটাকে ‘হেভেন’ বা আকাশ নাম দেন এবং ইহা দ্বারা সাতটি আসমান তৈরী করেন। তারপর আল্লাহ পানিকে সুকিয়ে দেন যাহা সত্ত্ব হয়ে একটি পৃথিবী তৈরী হয়, যাহা থেকে আল্লাহ সাতটি দুনিয়া তৈরী করেন রবি এবং সোম বারে। তারপর আল্লাহ সাতটি দুনিয়াকে স্থাপন করেন একটি বিশাল তিমি মাছের পিঠের উপর যাহা কোরানে বর্ণিত আছে ‘নান’ (Nun) হিসেবে। সেই মাছটি আবার অবস্থান করছে পানির উপর, পানি অবস্থান করছে একটি বিরাট পাথরের উপর, পাথরটি আছে একটি বিশাল ফেরেশতার পিঠের উপর, ফেরেশতাটি দাড়িয়ে আছে একটি বিশাল পাথরের উপর, সেই পাথরটি আছে বাতাসের উপর, পৃথিবীর ভাড়ে সেই তিমি মাছটি নড়েচড়ে উঠায় পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয় তখন আল্লাহ সেই পৃথিবীতে অনেক পাহাড় স্থাপন করেন যাহাতে এই দুনিয়া আর কখনো ভূমিকম্প না হয়।

(সুত্র— *"The History of Al-Tabari: General Introduction and From the Creation to the Flood, translated by Franz Rosenthal [State University of New York Press (SUNY), Albany, 1989], Volume 1, pp. 218-220)"*)

(দুই) দ্বিতীয়টি হল এইরূপ—“আল্লাহ যখন মনস্থির করলেন পৃথিবী বানাবার তখন তিনি বাতাসকে হুকুম করলেন সাগরের সকল পানিকে খুব জোড়ে গুটাইতে (Churn up) যাহাতে অনেক ফেনার সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্রের ঢেউ থেকে ধূয়ার সৃষ্টি হয়। তারপর আল্লাহ হুকুম করলেন সমুদ্রের ফেনাকে সুকিয়ে শক্ত বস্তুতে পরিণত হইতে। মাত্র দুইদিনে আল্লাহ পানির উপরে সুকনো ভূমি তৈরী করেন, যেমন আল্লাহ কোরানে বলেছেন (৪১:৯-বল, তোমরা কি অবিশ্বাস কর তার উপর যে দুইদিনে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?)। তারপর আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলিকে হুকুম করলেন স্থির এবং সত্ত্ব হয়ে যেতে যাদেরকে পাহাড় বানিয়ে পৃথিবীতে পেরেকের ন্যায় স্থাপন করলেন যাহাতে পৃথিবী মানুষদের নিয়ে আর কখনো কেপে না উঠে (কোরান-২১:৩১)।

(তিন) তৃতীয়টি হল এইরূপ—আল্লাহ পানি থেকে ভূমি (দুনিয়া) বানাবার পর সেটা মানুষদেরকে নিয়ে পানিতে নৌকার মত দুলিতে/কাপিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তায়ালা একজন মহাশক্তিশালী ফেরেশতাকে পাঠালেন সেই পৃথিবীটি তার কাঁধে নিবার জন্য। সেই বিশালকায় ফেরেশতাটি তার দুই হাত পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে প্রসারিত করে পৃথিবীটির দুই দিকের শেষ সিমানায় শক্তকরে ধরিল। কিন্তু, ফেরেশতাটির নিচে দাড়ানোর কোন জায়গা না থাকায় আল্লাহ একটি ‘এমার্যান্ড’ পাথর সৃষ্টি করলেন যার মধ্যখানে ছিল সাত হাজার ছিদ্র। একেকটি ছিদ্রতে আছে একটি করে সাগর যার বিবরণ কেবল আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারেন। আল্লাহ হুকুম করলেন সেই পাথরটিকে ফেরেশতাটির পা’এর নিচে স্থির হয়ে থকতে। কিন্তু, পাথরের নিচে আর কিছু না থাকায়, আল্লাহ সৃষ্টি করিলেন একটি প্রাকান্ত ষাড় যার ছিল চল্লিশ হাজার মাথা, আশি হাজার সিং, চোখ, কান, চল্লিশ হাজার জিব্বা, চল্লিশ হাজার পা। ষাড়টির নাম ছিল—রায়ান। আল্লাহ ষাড়টিকে হুকুম করলেন

সেই পাথরটিকে তার সিং দিয়ে ধরে রাখতে। কিন্তু সেই ষাড়টির পা রাখার কোন জায়গা না থাকায় আল্লাহ সৃষ্টি করলেন একটি অতিকায় বড় তিমি মাছ যার দিকে কার তাকাবার শক্তি ছিল না কারণ তার আকার ছিল অসামান্য বড় এবং আরও ছিল অসংখ্য চক্ষু। জানা যায় সে সেই তিমি মাছটি এত প্রকাণ্ড ছিল যে তার কাখনা (Gills) এর উপর যদি একটি সাগর রাখা হয় তবে তাকে মনে হবে একটি ক্ষুদ্র সড়িষা বীজের ন্যায়। মাছটির নাম ছিল বেহমুত। আল্লাহ সেই মাছটিকে হুকুম করিলেন ষাড়টিকে তার পিঠে রাখতে। মাছটি ঠিক তাই করিল। সেই মাছটিকে আল্লাহ স্থাপন করলেন পানিতে। সেই পানির নিচে আছে বাতাস, বাতাসের নিচে আছে অন্ধকার।

সূত্র- (Ibid., translated by Wheeler M. Thackston Jr. [Great Books of the Islamic World, Inc., Distributed by Kazi Publications; Chicago, IL 1997], pp. 8-10;)

(৪৩) অভিশপ্ত নমরুদের জন্ম ও বংশ পরিচয়!

নমরুদ প্রাচীন কালের এক কুখ্যাত বাদশাহ ছিল। দুনিয়ার ইতিহাসে যে সকল শক্তিমান ও ক্ষমতামূলী রাজা-বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল-আলামিনের পরম শত্রু ও চরম অবাধ্য ছিল, নমরুদ তাহাদের অন্যতম। নমরুদের বংশ পরিচয় ছিল এইরূপঃ হযরত নূহ (আঃ) এর অন্যতম পুত্রের নাম ছিল হাম। তাহার বংশধরগণ অধিকাংশই হিন্দুস্থানের অধিবাসী ছিল। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল আজম। আজমের পুত্রের নাম ছিল কেনান। নমরুদ এই কেনানেদেরই পুত্র ছিল। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে নমরুদের নাম ছিল **কায়কাউস**। কায়কাউসের পিতার নাম ছিল **কায়কোবাদ**। তাহার পিতার নাম ছিল **জামশিদ**।

নমরুদ বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী এবং কর্মঠ ছিল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই সে প্রধান উজীরের পদ হইতে বাবেলের বাদশাহী পাইয়া বসে। অতঃপর স্বীয় যোগ্যতা বলে সে নিজের ধন-দৌলত এবং প্রভাব-পত্তি অতি মাত্রায় বাড়াইয়া ফেলে। কিছুদিনের মধ্যেই সে স্বীয় বাহুবলে সমগ্র সিরিয়া, তুর্কিস্থান, হিন্দুস্থান, রোম ইত্যাদি রাজ্য দখল করিয়া বা পরাজিত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত করতঃ তাহাদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করে। **নমরুদ সুদীর্ঘ এক হাজার সাতশত বৎসর** আয়ুলাভ করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল সে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে এক সুবিশাল রাজ্যের শাসনকার্য করিয়া গিয়াছে। এতবড় রাজ্যের অধিকারী হওয়ার কারণে সে খুব বেশী গর্বিত হইয়া পড়িল এবং সে নিজেকে খোদা বলিয়া ঘোষণা করিল। সে এইরূপ ঘোষণা করিল যে, **‘আনা রাব্বুকুমুল আ’লা’** অর্থাৎ আমিই তোমাদের খোদা ও প্রতিপালক।

নমরুদের রাজদরবারে তৎকালীন দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী-গুণী এবং বিজ্ঞজনের আনা-গোনা ছিল। একদা নমরুদ স্বীয় পাত্র-মিত্রসহ উপবিষ্ট। এমন সময় রাজকীয়

প্রধান জ্যোতিষী আসিয়া বাদশাহকে অভিবাদন করিল। বাদশাহ তাহাকে গস্তীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি সংবাদ জ্যোতিষী! বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিষী অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষবদনে অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল—‘জাহাপনা সংবাদ তেমন সুভ নহে।’ বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল—কি ঘটনা, খুলিয়া বল। ইহা শুনিয়া জ্যোতিষী বলিল—‘কিছুদিন হয় আকাশে একটি নুতুন তারকার উদয় হইয়াছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি গনিয়া দেখিলাম তিনদিনের মধ্যে আপনার রাজ্যে একটি শিশু জন্ম নিবে এবং ভবিষ্যতে সেই শিশু আপনার সাথে চরম শত্রুতায় অবতীর্ণ হবে এবং সেই হবে আপনার পতনের কারণ। জ্যোতিষীর মুখে এই কথা শুনিয়া নমরুদ বাদশাহ একাধারে ভীত এবং ক্রোধে গর্জীয়া উঠিয়া সকল রাজ-কর্মচারীদেরকে বলিল—এখনি এই সম্পর্কে সকল ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন। রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করিয়া দাও—আজ থেকে তিনদিন পর্যন্ত কোন স্বামী-স্ত্রী যেন একত্রে বাস না করে এবং কোন অবস্থায় যেন তারা পরস্পর মিলিত না হয়। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে, তবে তাহার একমাত্র শাস্তি হইবে জীবন দণ্ড। নমরুদের এই কঠিন আদেশ শুনিয়া তাহার লাখ লাখ সৈন্য-সামন্ত প্রত্যেক প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রকাশ্যে এবং গোপনে পাহারা দিতে লাগিল যাহাতে কোন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একত্রে মিলিত হইতে না পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের শোবার ঘড়ে একটি করে সৈন্য তলোয়ার হাতে দড়িয়ে থাকল।

(৪৪) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) এর জন্মগ্রহণ!

আলাহ তায়ালায় কুদরত ও মর্জীর বিরুদ্ধে কাহার কিছু করার সাধ্য নেই। যেভাবে বা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে হউক আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তব রূপলাভ করে। নমরুদের কঠোর নির্দেশ যথাযথভাবেই পালিত হইতেছিল। সারা রাজ্যের কোন দম্পতিই তিনদিনের জন্য আর মিলিত হতে পারে নাই। অথচ আল্লাহ তায়ালায় যাহা মর্জী ছিল তাহাই অবাধেই ঘটিয়া গেল। নমরুদ বাদশাহর দেহরক্ষীর নাম ছিল আজর। প্রতিদিন সে রাত জাগিয়া নমরুদের শয়নকক্ষে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকিত। আর তাহার স্ত্রী স্বগৃহে একাকিনী রাত্রি কাটাইত এবং যৌন-জালায় ছটপট করিত। যেদিন নমরুদের উল্লেখিত কঠোর ঘোষণা প্রচারিত হইল, সেদিন ঘটনাক্রমে আজরের স্ত্রীর মনে স্বামীর সঙ্গে মিলন বাসনা ভীষণ প্রবল হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে নমরুদের শয়ন কক্ষের দরজায় প্রহরী আজর একা বসিয়া কালক্ষেপন করিতেছিল এবং অনুকূল পরিবেশে তার মনেও কামোত্তেজনা দেখা দিল। এদিকে আজরের স্ত্রী রাজমহলের সদর দরজায় পৌছিয়া দেখিতে পাইল যে দরজায় নিয়োজীত প্রহরীদ্বয় বসিয়া নিদ্রায় মগ্ন। অতএব সে সম্পূর্ণ বিনা বাধায় অন্দের মহলে প্রবেশ করিয়া স্বামীর কাছে পৌছিল। আজর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘুমন্ত বাদশাহর পার্শ্ববর্তী কক্ষে স্ত্রীকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। বলাবাহুল্য, আজর দম্পতির এই মিলনেই আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে মাতৃগর্ভে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। কেহ কিছু জানিল না, বুঝিলনা, টেরও পাইল না। নমরুদের এত সাবধানতা ও সতর্কতা সত্ত্বেও সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহ নিজের কাজ সমাধা করিলেন।

তিনদিন অতিবাহিত হবার পর পূর্বোল্লিখিত জ্যোতিষী রাজদরবারে আগমন করতঃ বাদশাহকে বলিল— ‘জাহাপনা! আপনার এত সাবধানতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও আপনার পরম শত্রু সেই শিশুটি মাতৃগর্ভে আগমন করিয়াছে। বাদশা একথা শুনিয়া ভীতিপ্রদ হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করিয়া দিল—এখন হইতে এক বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যত শিশু জন্মলাভ করিবে তাহাদের প্রত্যেককে যেন হত্যা করা হয়। বাদশাহর আদেশে তাহার কর্মচারীগণ রাজের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত শিশু খুজিয়া পাইল সবাইকে হত্যা করিল। এভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু আকালে প্রাণ হারাইল। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমায় আজরের স্ত্রী যে অন্তসত্ত্বা হইয়াছে তাহাও লোকেরা জানিতে পারিলনা, কারণ আজরের স্ত্রীর পেটে কোন শিশুর গর্ভের লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই।

নির্দিষ্ট সময়ে আজরের স্ত্রী বহু সাবধানে নিকটস্থ একটি পর্বতগুহায় গমন করিয়া সন্তান প্রসব করিল। একথা সম্পূর্ণ গোপন থাকিল। আজরের স্ত্রী তার সন্তানটিকে পর্বতের গুহায়ই রাখিয়া আসিল। তবে আজরের স্ত্রী প্রত্যেকদিন অতি সাবধানে তার সন্তানকে পর্বতের গুহায় দেখিতে আসিত। আল্লাহর অফুরন্ত মেহেরবানীতে ঐ শিশুর হাতের একটি আঙ্গুল হইতে দুধ এবং আর একটি আঙ্গুল হইতে মধু নির্গত হইত। শিশুটি তাহায় পান করিয়া লোক চক্ষুরান্তরালেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিনে দিনে সাতটি বছর অতিবাহিত হইল। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বড় হইয়া নমরুদ বাদশাহকে ধংস করিয়াছিলেন।

(ইসলামী মোল্লাদের গাঁজার জোঁসের চোটে শিশু ইব্রাহীমের আঙ্গুল থেকে যথাক্রমে ‘দুধ এবং মধু’ নির্গত হয়! এর পর কাছাছুল আশ্বিয়া বইটিতে মোল্লাদের ধর্মীয়-গাঁজার জোসে বহু গাঁজাখোরী গাল-গল্প ফাঁধা হয়েছে এই নবী ইব্রাহীমের সম্বন্ধে যাহা আমি আর বর্ণনা করিলাম না পাঠকদের ধৈর্য্যচুতি ঘটবে সেই ভয়ে। পাঠকগণ বাইবেলে ইব্রাহীম নবীর জন্ম-বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝতে পারবেন ইসলামী মোল্লারা এই ঘটনাকে কিভাবে কুসংস্কার দিয়ে ভরে ফেলেছে।)

(৪৫) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র আকৃতি ও অনুপম সৌন্দর্য কেমন ছিল!

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন জন্ম নেন তখন তাঁর শরীর অপবিত্রতা থেকে পাক ছিল। তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করেন এবং তশরীফ আনা মাত্রই মহান রাব্বুল-আলামীনের সাথে আলাপ করেন। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে— ‘নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র দৈহিক গঠন ছিল মাঝারি ধরনের। অর্থাৎ তিনি বেশী উচু বা বেশী বেটে ছিলেন না। তাঁর পবিত্র শরীরের বর্ণ ছিল উজ্জল গৌর। তাঁর পবিত্র কপাল ছিল প্রসস্ত, ঞ্ছদয় ছিল সরু অথচ জোড়া লাগানো না হলেও উভয় ঞ্ছ খুব কাছাকাছি ছিল। ঞ্ছদয়ের মাঝামাঝি একটি রগ ছিল যাহা নবী (সাঃ) একটু রুগ্ন হলেই সেই পবিত্র রগ চাড়া দিয়ে উঠত। তাঁর পবিত্র নাসিকা ছিল দীর্ঘ ও উচু এবং তার উপর নূর চমকাতো। তাঁর পবিত্র ও মনোরম মুখমন্ডল খুবই সুন্দর ছিল। তাঁর

দাড়ি মোবারক এবং চুলের মাত্র বিশ গোছা চুল সাদা হয়েছিল। তাঁর চুল ছিল কোকরানো। তাঁর পবিত্র কোক রানো চুলের ভাঙ্গন ছিল মাঝারি ধরনের। তাতে নবী করিম (সাঃ) কে খুব সুন্দর দেখাতো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল ও সুন্দর ছিল। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড ছিল। তাতে নানা ধরনের নকশা আঁকা ছিল। তা'মোহরে নবীয়াত নামে পরিচিত ছিল। তার ওপর 'মুহাম্মদ রাসুল্লাহ' লেখা ছিল। নবী করিম (সাঃ) এর অন্তর্ধানের পর আল্লাহ পাক সে মোহরে নবীয়াত উঠিয়ে নেন। তাঁর বুক মোবারক প্রসস্ত ছিল। তাঁর বুকের ছাতি থেকে নাভী পর্যন্ত একটি সরু কেশ-রাজি ছিল। তাঁর পবিত্র বাহু, কাঁধ ও বুকে মোলায়েম কেশ ছিল। তার পবিত্র কাঁধ, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির হাড় বড় ছিল এবং উভয় হাতের কজি লম্বা ছিল। তার পবিত্র দেহ মোবারক সুঠাম, নূরানী, ভারসাম্যশীল, মাঝারি ধরনের ছিল। তার পবিত্র লালা পানিতে লাগলে ঐ পানি মিঠে হয়ে যেত। **রাতে রাতেও তিনি দিনের মত দেখতেন।** কোন শিশু যদি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র লালা চেটে ফেলত, তবে সারাদিন ঐ শিশুর আর দুধ পান করতে হত না। তার শরীরের ছায়া মোবারক মাটিতে পড়ত না। তার আওয়াজ মোবারক অন্যদের আওয়াজের চেয়ে বেশী হত এবং দূরের লোক তা' শুনতে পেত। সজাগ থাকলে যেরকম শুনতেন তিনি গুমিয়ে থাকলে তেমনি শুনতে পেতেন। তিনি নিরবে বসে থাকলে তাঁর চেহারা গাভীর ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেত। দূর থেকে দেখলে তাকে সজীব দেখাত এবং কাছে থেকে দেখলে তাঁকে সুন্দর, লাবন্য ও মাধুর্য অনুভব করত। তিনি কখনো পানির পিপাসায় কাতর হতেন না। **তিনি সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি পেছনেও সেরূপই দেখতেন।** তাঁর সরীর মোবারকে মশা বা মাছি বসতনা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীর মোবারক থেকে সর্বদা **মেশক-আম্বরের খুশবু** বের হত। তিনি বাজারে বা কোন স্থানে তশরীফ আনলে তাঁর দেহ সৌরভে মানুষ বুঝতে পারত যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তশরীফ এনেছেন। তিনি প্রকৃতিক প্রয়োজনে তশরীফ নিয়ে যাবার পর সেখানে বাহ্য-পেসাবের কোন চিহ্ন থাকতনা। কারণ মাটি তাহা নিমিষে গ্রাস করে নিত এবং সেখানে **আতর ও লোবানের খুশবু** বের হত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চলার পথে একখন্ড মেঘ সর্বদা ছায়া দিত। তিনি রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, তখন রাস্তার দুপাশের গাছ-পালা মাথা নুইয়ে দিত। হাটার সময় মনে হত, তিনি উচু স্থান হতে নিচু স্থানে নামছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত অপূর্ব সৌন্দর্যের ও প্রকৃতির মানব এ পৃথিবীর মানুষ আর কখনো দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখার কোন অবকাশ নেই। আমিন।

(অন্ধ-ভক্তি এবং অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মন-মস্তিস্কে জন্ম নেয় অসংখ্য অবাস্তব কুসংস্কারযুক্ত চিন্তা ও কথা। আর তা'দিয়ে দিনে দিনে তৈরী হতে থাকে অসংখ্য অবাস্তব এবং যুক্তিহীন বর্ণনা বা অবাস্তব ঘটনার। অন্ধ ভক্তদের স্তুতি, প্রশংসা, আরাধনা, খোসামোদ, স্তুতি গাইতে গাইতে একজন অতি সামান্য ব্যক্তি বা অতি খারাপ চরিত্রের একজন মানুষকেও উপরে উঠাতে উঠাতে একেবারে ফেরেশতাদের সমান করে ফেলে অন্ধ ভক্তরা। এমনকি কাউকে কাউকে স্বয়ং আল্লাহর কাতারে নিয়ে ফেলে। ঠিক এটাই ঘটেছে এই ইসলামের নবী মুহাম্মদের

খুশবু” আসতে দেখা যায় অথবা, তার (দুরগন্ধময়) থুথুও হয়ে যায় মধুর মত মিষ্টি অথবা মুহাম্মদ রাত্রির ঘন-অন্ধকারেও পরিস্কার দেখতে পেতেন!

এমনটি আমরা দেখতে পাই ইসলামের পীর-দরবেশদের বেলায় ও। ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের পীরদেরকে ঠিক এভাবেই অলৌকিক কাহীনি ফেঁধে স্বাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে একেবারে অনেক উপরে উঠানো হয়ে থাকে। আর এভাবেই সাধারণ মুসলিম আমজনতার মাথা খাওয়া হয় এবং তাদের পকেট লুটপাট করা হয়ে থাকে।)

সূত্রঃ কাছাছুল আশ্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ (মাওলানা ইউসুফ আলী); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)